Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 219 –229
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

রাষ্ট্রচিন্তায় 'ব্যক্তি' ও 'সমষ্টি' : বিবেকানন্দের 'ব্যক্তিস্বাধীনতা ভিত্তিক সমাজতন্ত্র'-র একটি অনুসন্ধান

কৌশিক চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
খড়গপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর
ইমেইল : kchakraborty.ju@gmail.com

Keyword
ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, বৈচিত্র্য, বিশেষাধিকার, মানবিক মর্যাদা, ব্যষ্টি-সমষ্টি, একত্ব।

Abstract
ব্যক্তির জন্য সমষ্টি, না কি, সমষ্টির জন্য ব্যক্তি— রাষ্ট্র চিন্তা বরাবর এই প্রশ্নকে কেন্দ্রে রেখেই আবর্তিত হয়েছে, হয়ে চলেছে। ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, একইসাথে ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর সমান গুরুত্ব আরোপ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তায় খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায়, উপমহাদেশের ইতিহাস জনিত কারণে, এই জাতীয় ভাবনার যথার্থ প্রেক্ষিতই তৈরি হয়নি। এমনকি, বাংলার নবজাগরণের যে যুক্তিবাদ কিংবা মানবতাবাদের ধারণা, স্পষ্টভাবেই তা কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিসর তৈরি করেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় সেই ব্যতিক্রমী ভাব পাওয়া সম্ভব। একদিকে নবজাগরণ এবং অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তথা প্রাচীনভারতের 'oneness' এর বোধ যার সত্ত্বা নির্মাণ করেছিল, সেই বিবেকানন্দ কিভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একে অপরে পরিপূরক ভাবেন এবং কেন তিনি একটিকে অন্যটির জন্য অপরিহার্য্য বলে মনে করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Discussion
স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আবার ব্যক্তিস্বাধীনতাকেও দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছেন। বিবেকানন্দের কাছে রাষ্ট্রচিন্তার পরস্পর বিরোধী দুই তত্ত্ব একই সঙ্গে গুরুত্ব তো পেয়েইছে উপরন্তু কিভাবে এই দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব যুগপৎ কার্যকরী হতে পারে - তারও দিকনির্দেশ করেছেন তিনি। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে অনন্য কেননা, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একই সঙ্গে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবনতা গ্রীক রাষ্ট্র চিন্তার পর আর দেখা যায় নি।

কিন্তু গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা যে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ না করার নীতি অনুসরণ করেছিল তার সুফল পাওয়া যায় নি। এরিস্টটল যতই বলুন, মানুষকে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে তাকে

অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিতেই হবে, ইতিহাস কিন্তু এটাই দেখাচ্ছে, সে সমাজ ব্যবস্থাতেই স্বাধীনতা ছিল নিতান্তই একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য একচেটিয়া আশীর্বাদ, সমাজের বৃহত্তর অংশ, যাদের ভেতর নারীরাও ছিলেন, বঞ্চিত হয়েছে এ অধিকার থেকে, মানবিক মর্যাদা থেকে। প্লেটোর ন্যায় বিচার (Justice) সম্পর্কিত তত্ত্ব বা সাম্যবাদের (Communism) তত্ত্বও এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি। এই তত্ত্ব সমূহে নির্দিষ্ট শ্রেণী রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব, নাগরিকত্ব সম্পর্কে তার ধারণা, অবসর সম্পর্কে এরিস্টটলের বক্তব্য - প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন উপেক্ষিত কে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত সহজ।

প্রাচীন গ্রীসের পরেই দেখা যাবে রোমান আইনকে, যেখানে সিসেরারো ন্যায় বিচারের ধারণা ব্যক্তিস্বাধীনতার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এখানেও তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া গেল না। রোমানরা স্বাধীনতা ও অধিকারের তুলনায় বিশাল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়েই অধিক মনোযোগী হলেন। তাই দেখা গেল সামরিক বাহিনীর শক্তি ও আমলাতান্ত্রিক উৎকর্ষতা এক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা প্রসব করল।[১] দাসপ্রথা ছিল এই সময়কার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সময়টা মধ্যযুগের – সেন্ট অগাষ্টিন এর City of God এর হাত ধরে খ্রীষ্টধর্মকে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং তার পরে ওল্ড টেস্টামেন্ট ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই পর্যায়ে ইহকাল অপেক্ষা পরকাল গুরুত্ব পেয়েছে অধিক, মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বর। সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের সাথে সাথে সময়টা কেটেছে কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে - একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে চার্চ। চতুর্দশ শতকে পোপ অষ্টম বোনিফেসের বিরুদ্ধে ফিলিপ ফেয়ারের জয় রক্তক্ষয়ী পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটালেও শেষ পর্যায়ের (মধ্যযুগের) চিন্তাবিদগন কিন্তু তাদের রচনার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের যে বৃত্ত তা থেকে বের হতে পারেন নি। উদাহরন হিসাবে দান্তে আলিঘিয়ারী (১২৬৫-১৩২১), পাড়ুয়ার মাসিলিয়াস (১২৭০-১২৪০) এর নাম উল্লেখ করা যায়, যারা যৌক্তিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন। নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় কর্তৃত্বমূলক শক্তিসমূহের উপর মানবিক মর্যাদার কথা ঘোষণা করলেও মার্টিন লুথারের পরিবর্তিত অবস্থান ষোড়শ শতকে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়।

অর্থাৎ মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি ইতিহাসের আনুকূল্য লাভ করতে বারংবারই ব্যর্থ হয়েছে। বঁদ্যা (১৫৩০-৯৬) ও হবসের (১৫৮৮-১৬৭০) হাত ধরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচারিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব রাষ্ট্রশক্তিকেই মদত দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যদি রেনেসাঁর সময় থেকে একটা সার্বিক চিত্র অঙ্কন করা যায় তবে দেখা যাবে এই বৌদ্ধিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের সাথে সমর্থিত হয়েছে স্বাধীনতার নীতি, যার সূত্র ধরেই, ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদ বিরোধী চরম প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে পিউরিটান বিপ্লব রাজকীয় কর্তৃত্ববাদের প্রবল বিরোধীতা করে এবং ঐ শতকেরই শেষ লগ্নে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়ায়। যাই হোক, টমাস হবস্ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যে চরম সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রচার করলেন সেখানে সার্বভৌমের বিরোধীতা করার কোন অধিকার প্রজাদের তিনি দিলেন না, পক্ষান্তরে জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারন মানুষের অধিকারের ধারণা কিন্তু বেশ শক্ত জমি খুঁজে পেয়েছিল। লকের মতে সরকার Fiduciary Trust হিসাবে তার কর্ম সম্পাদন করবে। জনগনের অধিকার (লকের মতে এই অধিকার হল জীবন, স্বাধীনতা ও বৈষয়িক সম্পত্তির অধিকার) রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ হলে সরকারের ক্ষমতা আপনা থেকেই সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত হয়।[২] এভাবে লক জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের আদর্শকেও (যেখানে রাজা ও জনসাধারণ সমান বলা হয়েছিল) অতিক্রম করে যান, চূড়ান্ত ভাবে নস্যাৎ করেন ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বকে। রাষ্ট্রচিন্তার এ পর্যায়ে সমষ্টি প্রাধান্য পেল, ব্যক্তি নয়। এর পরেই অষ্টাদশ শতকের মহান চিন্তাবিদ জাঁ জ্যাকুয়েশ রুশো (১৭১২-১৭৭৮) জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রচার করলেন। এক স্ব-বিরোধীতা তার মধ্যে দেখা গেলেও, লক্ষ্য রাখতে হবে ১৭৫১ থেকে ১৭৫৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত ডিসকোর্স সমূহের মধ্যে তিনি যা খুঁজে পেয়েছিলেন পরবর্তীতে ১৭৬২ সালে The Social Contract এ তিনি তাই খুঁজে পেয়েছেন – মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতা। এটা ঠিক যে ডিসকোর্স সমূহের বক্তব্যের সাথে সামাজিক চুক্তির কোন সাদৃশ্য নেই। এই সত্য স্বীকার করেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, উভয় ক্ষেত্রেই মূলভাবের

প্রশ্নে রুশো সন্দেহাতীতভাবেই দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। ফলতঃ লকের চেয়ে একধাপ এগিয়ে গনসার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল অষ্টাদশ শতকে যদিও, Unreal will বা অপ্রকৃত ইচ্ছার প্রেক্ষিতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাধীন করার যে তত্ত্ব রুশো দিলেন তা স্পষ্টতঃই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, ব্যক্তি অধিকারকে অস্বীকৃতি জানালো। যাই হোক, সাধারণের ক্ষমতায়ন ও অধিকারের যে তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া মোটামুটি লক থেকে আরম্ভ হয়েছিল তা জর্জ উইলহেলম্ ফ্রেডরিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) কাছে আবারও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়ায় যখন হেগেল রাষ্ট্রের অধিবিদ্যক তত্ত্ব প্রচার করেন 'The Philosophy of History' গ্রন্থে। তিনি রাষ্ট্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত এবং ব্যাখ্যা করলেন তাতে অধিকার ভোগের ধারণা রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশের সাথে লীন হয়ে গেল। এর পরেই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) এবং কিছুটা ভাব বাদী টি. এইচ. গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২)। বলে রাখা দরকার সপ্তদশ শতকে পিউরিটান বিপ্লবের হাত ধরে উদ্ভূত রাজনৈতিক ভাবনার মূল নির্যাসই হল উদারনীতিবাদ যা সপ্তদশ শতকে মিলটন ও জন লক, অষ্টাদশ শতকে বেন্থাম, উনবিংশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল এবং ভাববাদী গ্রীন এর ভাবনার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিন্তাবিদগন মানুষের স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব থেকে অনুসৃত হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা যা পূর্ণতা পায় উনবিংশ শতকে, জন স্টুয়ার্ট মিলের হাত ধরে। মিল ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপস করেননি। সমষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাছে। আবার তিনি যখন 'Self Regarding Action; 'Other Regarding Action' এর কথা বললেন তখন পরিষ্কার বোঝা গেল ব্যক্তিকে তিনি সমাজ থেকে বের করে এনে পৃথকভাবে দুটো ক্ষেত্রর জন্ম দিলেন।[৩] এর পরেই গ্রীনের দিকে তাকালে মনে হবে তা যেন মিলের কর্মের অধিকার সংক্রান্ত বক্তব্যের সম্প্রসারিত রূপ। মিল 'Other Regarding Action' এর প্রশ্নে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রনের পক্ষে অন্যদিকে গ্রীন তো স্বয়ং ভাববাদী। ফলতঃ তাঁর আলোচনায় রাষ্ট্র দৈব শক্তির প্রকাশ হবে - এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে ভাববাদী গ্রীন, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য সবসময়ই বলি প্রদত্ত তা বললেন না। তাঁর মতে, ব্যক্তি বিশেষ অবস্থায় ও প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধীতা করার অধিকারী। তবে এ অধিকার অত্যন্ত সীমিত - একমাত্র নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত অল্প কিছু মানুষেরই। মূল কথা, গ্রীনের ভাববাদী উদারনীতি রাষ্ট্রকে একটি ইতিবাচক মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদকে নৈতিক মানদণ্ডের লক্ষ্মন রেখায় আবদ্ধ রেখে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে পরবর্তী কালের কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বীজবপন করে।[৪] উনবিংশ শতকেই গ্রীনের সমসাময়িক কার্ল মার্কস্ (১৮১৮-৮৩) একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজতন্ত্রকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তা মানুষের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের পন্থা চিহ্নিত করেন যার সাহায্যে এক শোষনহীন সমাজের চিত্র বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সমষ্টি প্রাধান্য পায়। ব্যক্তি এখানে নিতান্তই গৌন। মোট কথা, মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিবিধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কখনো সমষ্টি বা কখনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচিত হয়েছে।

কিন্তু সমষ্টি ও ব্যক্তির স্বার্থ একই সাথে, সমান ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব - এটা একান্তই বিবেকানন্দের চিন্তার স্বকীয়তা। বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা প্রমান করেছেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে। 'মানুষের দেবত্ব' এবং এরই সূত্র ধরে 'বৈচিত্র্যে একত্ব' শীর্ষক বেদান্তের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যে মত পোষণ করলেন তার উপজীব্য বিষয়ই হল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বৈচিত্র্যের (যা ব্যক্তি স্বাধীনতার দোত্যক) অবসান ঘটানো নয়, বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্ত দর্শনের আলোচনায় দেখা যায় সমগ্র বেদান্ত দর্শনকে তিনি দুটো মূল সূত্রে তুলে ধরেছেন - এক, Divinity of Man বা স্বরূপতঃ মানুষের দেবত্ব এবং দুই, Essential Spirituality of Man বা মানুষের অপরিহার্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা। এই দুই স্তম্ভকে ভিত্তি করে তিনি সমাজ গঠনের দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক সমাজকে সেই সর্ব শক্তিধর অস্তিত্ব (যা মানুষে সুপ্ত) – তার স্বীকৃতির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে এবং মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সব উদ্দেশ্য কে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বেদান্ত 'Oneness' বা একত্বের কথা বলে সমস্ত ভেদাভেদ অস্বীকার করে। অর্থাৎ বেদান্ত প্রয়োগ করলে যে সমাজ ব্যবস্থা

পাওয়া যাচ্ছে তা এক অভিনব সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যেক মানুষকে সেই সর্বজ্ঞ শক্তিমান স্বরূপ দেখে থাকে এবং সেই স্বরূপের জাগরণ ও পুনর্গঠনের কথা বলে ফলতঃ প্রাথমিক ভাবে এর মাধ্যমে যে একাত্ববোধ প্রকাশিত হয় তার ভিত্তিতেই বিবেকানন্দ সব মানুষের সমান অধিকার নয়, বরং এক ধাপ এগিয়ে একই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। বেদান্ত একত্ব প্রতিপন্ন করে সমানত্ব নয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না।অর্থাৎ বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়। সমাজের স্বাভাবিক গতির স্বার্থে তা জরুরী। যেখানে বৈচিত্র্য থাকে সেখানে বলপূর্বক সমানত্ব কার্যকরী করা যায় না। এই রূপ সমাজে কোন প্রকার বিশেষ সুবিধার স্থান নেই কেননা একত্বই এখানকার মূল নীতি। অনন্ত শক্তির আঁধার সমস্ত দীন দরিদ্র, অজ্ঞ, আস্তিক, ধার্মিক, নাস্তিক - সবার সবক্ষেত্রে সমান অধিকার – সামাজিক বণ্টনে, শিক্ষায়, জ্ঞানার্জনে, জীবিকায় সর্বত্র। এভাবে বিবেকানন্দের কাছে ব্যক্তি ও সমষ্টি পরস্পর একদেহে লীন হয়েছে। বৈচিত্র্যহীনতা মৃত্যুর সমতুল – অথচ সেই বৈচিত্র্য একই ভাবের প্রকাশ। এ ভাবে বহুত্বের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে বহুত্বকে বিশ্ব বিধানের মূল স্বরূপ হিসেবে দেখেছেন তিনি।[৫] বিবেকানন্দের এই একত্ব কিন্তু প্রানচাঞ্চল্যহীন সমাজ ব্যবস্থা নয়। একাত্বর অভাবে যেমন ভেদ বৈষম্য বৃদ্ধি পায় তেমনই বৈচিত্র্য না থাকলেও সৃষ্টিশীলতার অভাবে সমাজের মৃত্যু হয়। কেউ সুন্দর হবে, কেউ হবে না, কেউ প্রতিভাধর হবে, কেউ হবে না। কিন্তু যে সুন্দর, যার প্রতিভা রয়েছে সে কোন বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে না। মানুষে মানুষে যেমন পার্থক্য থাকে, স্বরূপে ঐক্যও থাকে। বস্তুতঃ এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখেই কার্যকরী হয়েছে বিবেকানন্দের ব্যক্তিস্বাধীনতা ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের ধারনা।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমর্থন করে বলেছেন –

> "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত, ব্যক্তির জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়।"[৬]

আবার এই বিবেকানন্দই বলেন—

> "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির সুখ... অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।"[৭]

আক্ষরিকভাবে এদুটি বক্তব্যকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতেই পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, দ্বিতীয় বক্তব্যের মাধ্যমে বিবেকানন্দ কিন্তু শ্রেণী স্বার্থ ও সমষ্টি অর্থাৎ সাধারণের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারকে মানতে নারাজ। শ্রেণীর বিশেষ অধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার অর্থই হল সমষ্টি তথা সাধারণের বঞ্চিত হওয়া। সমষ্টির একক হিসাবে ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া। সেকারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ জীবনের মূল লক্ষ্যই হল মানুষের সব স্বার্থকে ব্যক্তির বিকাশ সাধনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রন করা।

একটি সত্তার অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনার সার্থক রূপায়নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিভাত হওয়ার ঘটনা ঘটে বলেই স্বামীজী বললেন, একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান, তারতম্য কেবল প্রকাশের মাত্রায়। তাঁর ভাষায় –

> "এই দরিদ্রগনকে-ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবল-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে শুনাও শিখাও- সবল, দুর্বল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের ভেতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে।"[৮]

যদি তাই হয় তবে শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে একই সুযোগ প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বামীজী যেমন শ্রেণীর বিশেষাধিকার মানেন নি, তেমনি তিনি সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে জোর করে আত্মত্যাগ করানোর সম্পূর্ণ বিরোধীতাও করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল ব্যক্তির বিকাশের পথে সব বাধার অপসারন ঘটানো। অর্থাৎ, ব্যষ্টির জন্য সমষ্টির ভূমিকাকে নির্দেশ করলেন বিবেকানন্দ। তার কাছে প্রধান হচ্ছে ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির কল্যাণ- যে

উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সমষ্টির উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন- "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক, ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত"[৯] ব্যক্তি ও সমষ্টি প্রতিযোগী হিসেবে আদৌ তার ভাবনায় স্থান পায়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিষয়টিকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, কারন তিনি শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন। বাস্তবের ভিত্তিতেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন – সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ নাকি তুমি-আমি দশজন বড়জাত? বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে অসামান্য এক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় –

> "একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেলে, আর একজন কিনলে। পাহারাদারের নাম হল রাজা, মুটের নাম সওদাগর - যে জিনিস তৈরী করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' বলে ডাকতে লাগলো"[১০]

এ ভেদ রেখা তিনি নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে।

> - "হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক। তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু।"[১১]

কুল বা জাতি বিশেষের হাতে বিদ্যা বা শক্তি পুঞ্জিভূত হতেই পারে। এক্ষেত্রে স্বামীজীর মত হল –

> "সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জিকৃত। যদি তাহা না হইতে পায় সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষীপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[১২]

লক্ষ্যনীয় যে প্রতিটি শ্রেণীর পালনীয় কর্তব্যের উল্লেখ এক্ষেত্রে রয়েছে, সামগ্রিক ভাবে সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি যা বলতে চাইলেন তা হল – কোন বিদ্যা বা শক্তি কোন বিশেষ শ্রেণী অর্জন করলেই তাতে সেই শ্রেণীরই অধিকার থাকবে, তা নয়। যদি অধিকৃত বিদ্যা বা শক্তি সমাজের সর্বস্তরে না পৌঁছাতে পারে তবে সমাজ ক্রমে ধ্বংস কবলিত হয়। জনসমাজের প্রত্যেকটি অংশকে সমান গুরুত্ব দিলেন স্বামীজী। বিবেকানন্দের এই ধারণার সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের 'বহুত্ববাদ' এর সাযুজ্যতা পরিলক্ষিত হয়, বিভিন্নতাকে স্বীকার করেই ঐক্যের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। বহুত্ববাদ শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের স্বীকৃতিই নয়--- বরং তা বিভিন্নতাকে বরণ ও তার সাথে একাত্মতা রচনা করে। বহুত্ববাদ শুধু ভিন্নতার প্রতি সহনশীলতা নয় বরং তা ভিন্নতাকে বোঝার সক্রিয় উদ্যোগ। পারস্পরিক মত বিনিময়; ভাবের আদান-প্রদান ও তা আত্মিকরণের মাধ্যমে বহুত্ববাদ ঐক্যের সন্ধান দেয়। আত্মপরিচয়ের রাজনীতির যে সীমাবদ্ধতা বহুত্ববাদ তাকে নিয়ন্ত্রণ ও অতিক্রম করতে পারে।

স্বামীজীর চিন্তায়, প্রকৃতির নিয়মেই বৈচিত্র্য ধ্রুবসত্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল –

> "আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন, সকল মানুষ এক রূপ হউক, ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না – যত দিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রানের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় অসম্ভব।"[১৩]

এটাই যদি সত্য হয় তবে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? লক্ষ্য রাখতে হবে, স্বামীজী সার্বিক কল্যাণের জন্য শ্রেণীসমূহের পালনীয় কর্তব্যকে উল্লেখ করেছেন। এই কর্তব্য কর্মেও প্রানের সঞ্চার করলেন,

> "আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমার অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে ইহাও হইতে পারে না, কারন অবস্থার পার্থক্য সত্বেও আমাদের ভেতরে সেই একই সমতা বিদ্যমান।"[১৪]

অর্থাৎ প্রকাশের মাত্রার তারতম্য থাকলেও যেহেতু একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সেহেতু কেউ ছোট নয়, হীন নয়, তুচ্ছ নয়। বড় হওয়ার অনন্ত সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকেরই। যান্ত্রিক সমতার দ্বারা বৈচিত্র্যের অবসান নয়, বরং ব্যক্তির বিকাশের জন্য শ্রেণী বিশেষের সকল প্রকার বিশেষাধিকারের অবসান ঘটিয়ে সকলের সমান মানবিক অধিকার স্বীকার, সকলকে সমান মর্যাদা ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে সাম্য অনয়ন – এটাই স্বামীজীর এই দৃষ্টভঙ্গির মূল উপজীব্য বিষয়। সকলকে একরকম করা যাবে সত্য কিন্তু সকলকে সমান মানবিক মর্যাদা ও শক্তির যে সমতা প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান তাকে প্রকাশের লক্ষ্যে সমান সুযোগ প্রত্যেককে নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। স্বামীজী প্রত্যেক

মানুষের মধ্যে দেবত্ব জাগাবার সাধনা করেছিলেন, কখনোই শ্রেণী বিশেষের নয়, সমষ্টির। যেখানে ব্যক্তির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ –

> "যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সে দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ।"[১৫]

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, বিবেকানন্দ কিন্তু শ্রেণীর বিবিধতার উপযোগিতা খুঁজে পেয়েছেন। একজন জুতো সেলাইয়ে পটু হতে পারে, অন্যজন রাজ্য শাসনে। সমাজ তথা সমষ্টির জন্য দুটো কাজেই দুজনকে প্রয়োজন, তা বলে প্রথমজনের মাথায় পদাঘাত করার অধিকার তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেন নি। স্বামীজী তাঁর সমষ্টির কল্পনায় শ্রেণীর অসাম্য দূরীকরণে ব্রতী হয়েছেন, অস্তিত্ব হরণে নয়।

সমাজতন্ত্রের ধারণাকে আমরা যেভাবে লাভ করে থাকি, স্বামীজীর সমাজতন্ত্রের সাথে সে ধারণার মৌলিক কিছু পার্থক্য বর্তমান। এ পার্থক্য বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদ ভিত্তিক, শ্রেণী ও সমাজের সম্পর্ক ভিত্তিক এবং রাষ্ট্রের চরিত্র ভিত্তিক। স্বামীজী ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যতা ও মৌলিকতার প্রেক্ষিতেই সমাজতন্ত্রের প্রচলিত ধারণাকে মানতে পারেন নি। তিনি যে অর্থে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছেন তা হল-

> "I am a Socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread."[১৬]

এখান থেকে দুটো প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথম প্রশ্ন হল – সমাজতন্ত্র 'half a loaf' কেন? এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রচলিত ধ্যানধারণা সম্পর্কিত বিবেকানন্দের নেতিবাচক ভাবনা গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে যা আসলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও নিজস্বতা রক্ষার স্বার্থে উচ্চারিত হয়েছিল—

> "... the doctrine which demands the sacrifice of individual freedom to social supremacy is called socialism..."[১৭]
>
> "…There is no mental activity, no unfoldment of the heart, no vibration of life, no flux of hope; there is no strong stimulation of the will, no experience of keen pleasure... there is no stir of inventive genius, no desire for novelty, no appreciation of new things... It never even occurs to this mind if there is any better state than this, where it does? ...it cannot convince; in the event of conviction, effort is lacking; and even where there is effort, lack of enthusiasm kills it out. If living by rule alone ensures excellence, if it be virtue to follow strictly the rules and customs handed down through generations, say then, who is more virtuous than a tree, who is greater devotee, a holier saint, than a railway train? Who has ever seen a piece of stone transgress a natural law? ... there is no manifestation of will ... in the machine, the machine never wishes to transgress law; the worm wants to oppose law – rises against law, whether it succeeds or not; ... Greater is the happiness, higher is the Jiva, in proportion as this will is more successfully manifest."[১৮]

অর্থাৎ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন, তার সমস্ত সম্ভাবনার সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিভাত হন বলেই স্বামীজী বিশ্বাস করতেন এবং সে কারনেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উন্নতির প্রথম শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সমূহের কারণে তিনি সমাজতন্ত্রকে 'half a loaf' বললেন তার পরিবর্তে তিনি কোন মডেল উপস্থাপন করেছেন? এক্ষেত্রে স্বামীজীর মত হল –

> "This is the work which tends towards sameness, towards unity, without destroying variety"[১৯]

অর্থাৎ বৈচিত্র্যকে মান্যতা দিয়ে এবং অন্তর্নিহিত আধাত্মিকতাকে আঘাত না করে জনসাধারণকে তাদের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেওয়াটাই প্রথম কাজ। একাজ সম্ভব অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারের মাধ্যমে। বনের বেদান্তকে গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রয়োগের মাধ্যমে শোষণ ও অবিচারের অবসান সম্ভব। একত্বের বোধ প্লাবিত হলে ঐহিক উন্নতি সম্ভব, দারিদ্রের অভিশাপ ঘোচানো সম্ভব। এই একত্বের বোধকে কার্যকরী করার উপায় - শিক্ষার বিস্তার। গ্রামে গঞ্জে যে 'হরিসভা'

ছিল সেই সময়ে সেগুলোর মাধ্যমে এই ভাব প্লাবিত করার পরিকল্পনা বিবেকানন্দ করেছেন। সাম্যের এই বার্তা ও পথ প্রচারের জন্য বলি প্রদত্ত সহস্র যুবক চেয়েছেন, সংঘের পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে স্বামীজী চিহ্নিত করেছেন যেখানে মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে কোন পার্থক্য নেই। এই সূত্রে পরবর্তী পর্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশীলতা এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শের মিলনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র তাঁর কাম্য যেখানে এদের নেতিবাচকতা সমূহ অনুপস্থিত। সার্বিকভাবে বিবেকানন্দ বহুমাত্রিক সংস্কৃতির উপযোগিতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বামীজী কিন্তু উল্লিখিত এই বর্ণ এর ধারণাকে গ্রহণ করেছেন তাদের কর্মকুশলতার প্রেক্ষিতে, জন্মসূত্রে নয়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য হল, –

> "The caste system is opposed to the religion of Vedanta. Caste is a social custom and all our great preachers have tried to break it down ... caste is simply the outgrowth of the political institutions of India, it is a hereditary trade guild ... beginning from Buddha down to Ram Mohan Roy, everyone made the mistake of holding cast to be a religious institution and tried to pull down religion and caste all together, and failed ... caste is simply a crystallized social institutions which after doing its service is now filling the atmosphere of India with its stench and it can only be removed by giving back to the people their lost social individuality"[২০]

এবং এ কারণেই স্বামীজী নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, যে ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটবে চাষীর লাঙল থেকে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলেমুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, মুদির দোকান, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। এ ভারত বের হবে কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। এ ভারত উদয় হবে ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় থেকে। এদেরকে কেবল স্বরূপ চেনাতে চেয়েছেন স্বামীজী যা থেকে তারা বিস্মৃত ছিল যুগের পর যুগ। দিতে চেয়েছেন প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার। স্বামীজী ইতিহাস ঘেটে দেখাচ্ছেন কিভাবে বিগত কয়েক শতকের সংস্কার সমূহ থেকেও এরা বঞ্চিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সকলের সমানাধিকারের প্রশ্নে স্বামীজী উচ্চ শ্রেণীকে নিচে টেনে নিম্ন শ্রেণীর সাথে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করার পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা দেওয়ার বিরোধিতা স্বামীজী করেছেন বটে, তবে, সামাজিক অবিচারের ফলে যারা এতদিন এই সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত কিছু সুযোগ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

দরিদ্র নারায়ণ সেবার আঙ্গিকে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে বঞ্চিতের দুর্দশা ঘোচাতে ব্যক্তি অধিকারের ধারণা দিতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ –

> "...if the son of a Brahmin needs one teacher, that of a Chandala needs ten. For greater help must be given to whom nature has not endowed with an acute intellect from birth.... The poor, the downtrodden, the ignorant, let these be your God."[২১]

যারা শুধুমাত্র নিজেদের জন্ম থেকে দাস ভেবে এসেছে তাদেরকে ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে পরিচিত করতে চেয়েছেন তিনি, যে শক্তি ব্যক্তির ভেতরেই লুকায়িত। তাই প্রাথমিক কাজ হলো শিক্ষার প্রসার - একেবারে মূলে, একেই তিনি বলেছেন 'Radical Reform'.[২২]

বিবেকানন্দ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যক্তি-সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান সমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু এর পরেও সমষ্টির বা সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্যক্তির ভূমিকা কিভাবে প্রশ্নের মুখে চলে আসে, বিবেকানন্দ সে আলোচনাও করেছেন–

> "শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়। আর তাহার নিজের জাতি, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না ...বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাত-পিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বর আধাঁর বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তলিত হইল, তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথীকুলের কি লাভ হইল - বিবেচ্য।"[২৩]

ব্যক্তির উন্নয়ন সমাজ জীবনের সার্বিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। প্রত্যেকের নিজ প্রকৃতি এবং নিজ বিশেষত্ব প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এ ধারণা যুক্ত। উপরোক্ত বক্তব্যের এটি একটি দিক। অন্যদিকে এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় ব্যক্তি-সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপনের জন্য বিবেকানন্দ জাতি ও বর্ণের প্রথাগত ধারণার মূলে গিয়ে সমস্যার স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন, সমাধান সূত্র নিরূপন করতে চেয়েছেন।

আসলে বিবেকানন্দ ছিলেন সেই দার্শনিক যিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিধাহীন দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। বিশেষতঃ 'মূক যারা দুঃখে শোকে তাদের অবস্থার পরিবর্তন না হলে পরাধীন ভারতের যে কিছুই হবার নয় তা তিনি বুঝেছিলেন অন্তর থেকে। সেকারণেই ইট-কাঠ-পাথরের পূজা ফেলে এঁদেরকেই আরাধ্য দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন স্বামীজী। একই সঙ্গে হৃত আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন তিনি—

> "কেহই প্রকৃত পক্ষে দুর্বল নহে। আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর – তোমার ভেতর যে ভগবান রহিয়াছেন তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর। তাঁহাকে অস্বীকার করিও না।"[২৪]

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন – নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে এই সত্যে। এই পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরিবের কিছু উপকার করবে – তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষেরই অপকার মাত্র। 'লক্ষ লক্ষ তাহাদের' আত্মোন্নয়নের পন্থা নিরূপণ করাই ছিল তাঁর যাবতীয় চিন্তার কেন্দ্রে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করেছেন বিবেকানন্দ –

> "...Being always governed by kings of Godlike nature, to whom is left the whole duty of protecting and providing for the people, they can never get any occasion for understanding the principles of self-government. Such a nation, being entirely dependent on the king for everything and never caring to exert it self for the common good or for self defence, becomes gradually destitute of inherent energy and strength..."[২৫]

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, এস্থানে বিবেকানন্দের বক্তব্যের John Stuart Mill (1806-1873 A.D.) এর ছাপ বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে। চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মিল যেমন মনে করতেন রাষ্ট্রশক্তির সর্বাত্মক প্রসার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী, তা প্রতিযোগীতার পরিবেশ কে সঙ্কুচিত করে। অন্যদিকে বিবেকানন্দও বিশ্বাস করেন একমাত্র প্রতিযোগীতার পরিবেশই পারে জাতিভেদ প্রথা কে দূরীভূত করতে –

> "with the introduction of modern competition, see how caste is disappearing fast! ... The Brahmana Shopkeeper, Shoemaker and Wine-distiller are common in Northern India. And why? Because of competition."[২৬]

প্রায় সমসাময়িক ও মিলের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও, স্মরণ রাখতে হবে, উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভাবনার প্রেক্ষাপট এক ছিল না। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের Laissez Faire এর সমর্থনে উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রতত্ত্ব হিসেবে জন স্টুয়ার্ট মিলের এই তত্ত্ব প্রচারিত। অন্যদিকে বিবেকানন্দের ভারত তখন পরাধীন, শাসকের অত্যাচারে দীর্ণ, জাতিভেদ প্রথার অভিশাপে শতখণ্ডে বিভক্ত।

তাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সামনে সেই মুহূর্তে লক্ষ্য দ্বিবিধ – রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে ধর্মকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা এবং দুই, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান। এলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমষ্টির কল্যাণের পথকেই শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার লক্ষ্যেই আঘাত করেছেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে, ধর্মীয় বিধি বিধানকে। আত্মশক্তিতে আস্থাবান মানুষ চেয়েছেন স্বামীজী, সে কারণেই তাঁর চিন্তায় নাস্তিক হলেন সে ব্যক্তি যিনি নিজেকেই বিশ্বাস করেন না – নিজের দৈব শক্তিকে যিনি সম্মান করেন না।

তাই স্বামীজীর চিন্তায়, সমষ্টির একক হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তিই হবেন স্বাধীন, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। বিবেকানন্দ বিভিন্ন জাতিকে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের মত দেখতেন যেখানে একটি অধ্যায় বাদ পড়লেই যেন ইতিহাস অসম্পূর্ণ। উত্তর আধুনিক মিশেল ফুকো কেও যেন এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামীজী অধিকারের প্রশ্নে,

সম্মানের প্রশ্নে সকলকে এক সারিতে রেখেছিলেন, কারণ পৃথিবীর সকল অনুন্নত ও উন্নত জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকতে পারে, সুযোগ সুবিধার প্রেক্ষিতে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার প্রশ্নেও পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু যা কিছু অর্জিত তা কারো একচেটিয়া নয়, তা সমষ্টি তথা সমাজের কল্যাণের জন্যই উৎসর্গীকৃত –

> "... সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায় সে সমাজ শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[২৭]
>
> "The new order of things is the salvation of the people by the people.."[২৮]

- এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু এ মুক্তি কি করে সম্ভব? - বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি এক্ষেত্রে স্বামীজী চান নি। তিনি চেয়েছেন শিক্ষার বিস্তার, যা একমাত্র জনসাধারণকে মুক্তি দিতে পারে, তাদের জাগ্রত করতে পারে। শিক্ষাই সেই একমাত্র হাতিয়ার যা নিজেকে বিশ্বাস করতে শেখায় এবং নিজেকে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের বিকাশ সাধিত হতে থাকে। স্বামীজীর মতে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যাবতীয় পার্থক্যই নিহিত রয়েছে এখানে, যা, আমাদের যাবতীয় পরাজয়ের মূলে। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তথাকথিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের পদাঘাতে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মনুষ্যত্ব থেকে বিস্মৃত হয়েছে, ভাবতে শিখেছে এটাই তার জন্য বিধাতা নির্দিষ্ট – তাদের হৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই, পরবর্তী কাজটা তারা নিজেরাই করে নিতে পারবে। সমষ্টির উন্নয়নে, এরই সঙ্গে ব্যক্তির উন্নয়নে, আরো তিনটি বিষয়কে স্বামীজী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন[২৯] –

ক. Conviction of the powers of goodness,
খ. Absence of jealousy and suspicion,
গ. Helping all who are trying to be good and to do good.

– সার্বিক ভাবে এ সকল উপাদান সমূহ দিতে পারে চিন্তা এবং কর্মের স্বাধীনতা, যাকে স্বামীজী জীবনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যেখানে এই দ্বিবিধ স্বাধীনতা অনুপস্থিত সেখানে ব্যক্তি তথা সমষ্টির উন্নয়ন অসম্ভব। একমাত্র এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যাবতীয় বিশেষাধিকারের ধারণা প্রতিহত করা সম্ভব, সম্ভব প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা। এ পন্থাতেই নিজেকে নিজে সাহায্য করতে শেখে মানুষ, নিজের মুক্তির পথ আবিষ্কার করে নিজেই।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিয়েও ভারতের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রামকেও সাহায্য করা সম্ভব নয় যদি না সেখানকার মানুষ নিজেদের সাহায্য করতে শেখে। অজ্ঞানতার যে রুদ্ধ দ্বার তা মুক্ত হতে পারে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে, ব্যক্তির ভেতর থেকেই, স্বাভাবিক ভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে। বিবেকানন্দের চিন্তায় যারা নিজেদের ব্রাত্য ভেবে অভ্যস্ত তাদের আত্মবিশ্বাস ও অধিকার বোধ ভিত্তিক শক্তি ফিরিয়ে আনাই গুরুত্বপূর্ণ। এই শক্তির অবস্থান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ, এমনকি এই শক্তিকে একত্রিত করার কোন উদ্যোগ বা সক্ষমতা-কোনটাই তাদের নেই। একারণেই তাদের ভাব (ideas) দিতে হবে, সংস্কৃতি (culture) দিতে হবে। কিভাবে একাজ করতে হবে সে পন্থাও নির্দেশ করেছেন স্বামীজী

--

> "We have to give them secular education. We have to follow the plan laid down by our ancestors, that is, to bring all the ideals slowly down among the masses. Raise them slowly up, raise them to equality..." [৩০]

এই প্রক্রিয়ার সূত্র ধরেই, স্বামীজীর চিন্তায়, যা ঘটবে "One must raise one self by one's own exertions..."[৩১] এ কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ না হবে ততক্ষণ কোন সংস্কারেই কোন উপকার হবে না। এর মাধ্যমে যে সমষ্টির জন্ম সে সমষ্টির শক্তিই আসল শক্তি। একারণেই, স্বামীজীর মতে, আমাদের অপেক্ষা হবে ততদিন, যতদিন না সমষ্টি শিক্ষিত

হয়ে ওঠে, যতদিন না তারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম অথবা সচেষ্ট বা উদ্যোমী না হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে এটা প্রমাণিত স্বামী বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রী কারণ তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক।

ব্যক্তির স্বাধীনতা, মৌলিকতা ও ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা সামাজিক কর্তৃত্বের কাছে বলি হয় বলেই তিনি প্রচলিত সমাজতন্ত্রের ধারণা মানতে পারেন নি এবং একারণেই তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করেই সমষ্টির কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, বলা ভাল, বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন কেন এবং কিভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা সমষ্টির জন্য অপরিহার্য। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ শ্রেণী স্বার্থকে ও বিশেষাধিকারকে অস্বীকার করে, উচ্চ ও নীচ বর্ণের ধারণাকে নস্যাৎ করে, জাতিভেদকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে, প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও সমতার মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করে, এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিভাবে তার ভাবনায়, ব্যক্তি ও সমষ্টি পরস্পরের পরিপূরক।

সমগ্র বিশ্ববিধানের মূল স্বরূপ দ্বিবিধ- একত্বের মধ্যে বহুত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে একত্ব। বহুত্ব অর্থাৎ পৃথক পৃথক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হলে ভাবনার বিভিন্নতা, চিন্তা ও সৃষ্টির বিবিধতা নষ্ট হয়- তাতে রূদ্ধ হয় সমাজের স্বাভাবিক গতি। তাই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে বিশেষাধিকার এবং এই বিশেষাধিকারের প্রেক্ষিতে নির্মিত ভেদ-অত্যচার-নিপীড়ন দূরীভূত করার পক্ষে বিকোনন্দ। তিনি বিশ্বাস করেন-সহ নৌ ভুনক্ত- একত্রে থাকাই মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। বিশেষাধিকারের বিলোপ ঘটিয়ে বেদান্তের 'Oneness' বা একত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য— যার মাধ্যমে অসাম্যকে প্রতিহত করা সম্ভব যেখানে মুখ্য কাজ হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনাময় সত্ত্বার স্বীকৃতির উপর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়ে তোলা।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ধারা : প্লেটো থেকে মার্কস, (অরুণ কুমার রায়চৌধুরী অনূদিত) প:ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭, পৃ. ১৬৪
২. William Ebenstein and Alan Ebenstein, Great Political Thinkers: From Plato to Present, Cengage learning, 6th Edition, 1999, p. 389
৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য, J.S. Mill, On Liberty (Everyman Edition), Longmans, Green & Co. London, 1869, Ch-II
৪. T.H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, Longman, Green & Co., London, 1950, p. 148
৫. দাশগুপ্ত, সান্ত্বনা, বিবেকানন্দের সমাজদর্শন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ) পৃ. ৪৮
৬. বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৪০
৭. বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ), উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৩৮
৮. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৪২
৯. বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ), উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৩
১০. তদেব, পৃ: ২৩৫
১১. বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৪৬ - ৪৭
১২. বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৫০ - ৫১
১৩. তদেব
১৪. বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৬০, পৃ. ২৪
১৫. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-6, Advaita Ashrama, 1976,

p. 381

১৬. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-4, Advaita Ashrama, 1976, p. 488

১৭. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-4, Advaita Ashrama, 1976, p.p. 489-90

১৮. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-1, Advaita Ashrama, 1976, p. 435

১৯. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-5, Advaita Ashrama, 1976, p.p. 22-23.

২০. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-6, Advaita Ashrama, 1976, p. 319

২১. বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৬০,পৃ. ২৩১

২২. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৬০, পৃ. ৮১-৮২

২৩. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-4, Advaita Ashrama, 1976, p. 441

২৪. The East and the West, Udbodhon, Kolkata, 1963, p. 42

২৫. শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৮৭

২৬. তদেব, পৃ. ৮২

২৭. স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ : তাঁর মানবতাবাদ, উদ্বোধন, কলকাতা, অষ্টম পুনর্মুদ্রন ২০০৬, পৃ. ৩৯

২৮. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-6, Advaita Ashrama, 1976, p. 247.

২৯. বসু, শ্যামাপ্রসাদ, বিবেকানন্দ: অনু থেকে অনন্ত, পত্রভারতী, ২০০৮, পৃ. ২১৪

৩০. স্বামী অলোকানন্দ (সঙ্কলিত), জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, উদ্বোধন কার্যালয় (দশম পুনর্মুদ্রণ), ২০০৯, পৃ. ৫৫

৩১. তদেব, পৃ. ৫২